http://www.elearninginfo.in

ভুবন ডাক্তার

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সপ্তাহ খানেক জ্বরে ভুগবার পর অন্নপথ্য করলাম। আর তার পরদিনই মাসিমাকে বললাম, 'আমার বাক্স বিছানা গুছিয়ে দাও, আজই কলকাতা পাড়ি দেব।'

মাসিমা অবাক হয়ে থেকে বললেন, 'এই দুর্বল শরীর নিয়ে, আজই যেতে চাস, তুই কি ক্ষেপেছিস না কি কল্যাণ!'

বললাম, 'চাকরির ব্যাপার মাসিমা। না গেলেই চলবে না। যে কদিন ছুটি ছিল, তার অনেক বেশি কামাই হয়ে গেছে। নতুন ম্যানেজার এসেছেন অফিসে, কি হয় বলা যায় না।'

একথা শুনে মাসিমা নরম হলেন। ভদ্রলোকের ছেলের শরীর একটু দুর্বল থাকে থাক, কিন্তু চাকরিকে দুর্বল করলে চলে না।

মাসিমা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তাহলে আর তোমাকে আটকাব না বাবা। চাকরি-বাকরির যা বাজার শুনি আজকাল। দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড় তাহলে। সাবধানমত যেয়ো, আর গিয়েই একটা পৌঁছ-সংবাদ দিয়ো।' তারপর একটু থেমে ফের বললেন, 'ভাল কথা, যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবিনে? বুড়ো তায় বামুন, একটা প্রণাম করে যাওয়াই তো ভাল, আশীর্বাদ করবেন।'

ঠিক। এতক্ষণে একটা কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মাসিমা। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা অবশ্যই দরকার। আশীর্বাদের জন্যে নয়, তাঁর মেডিক্যাল সার্টিফিকেটখানার জন্যে।

ফরিদপুর জেলার এই কাসিমপুর গ্রামে দুচার বিঘে জমি আমাদের এখনও আছে। তা কোনোদিনই ভোগে আসে না। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ভাবছি ছাড়িয়ে দিয়ে আসব। কিন্তু যাই যাই করে আর যাওয়া হয়নি। এবার হাত-টানাটানিটা একটু বেশি হওয়ায় মরিয়া হয়ে ছুটি নিলাম অফিস থেকে। ভাবলাম যা হয় একটা কিছু করে আসব। কিন্তু এসে বিশেষ কিছু লাভ হল না। জমির দর নেই, খদ্দের নেই। তাছাড়া মাসিমার মোটেই ইচ্ছে নেই আমরা জমি বিক্রি করি। তিনি বললেন, 'তাহলে আমার আর এখানে থাকা চলে না। জমি তো আর কামড়াচ্ছে না যে, মাটির দরে সোনা বিলিয়ে দিবি। আছে থাক না।'

মাসিমাকে বললাম না, কিসে কামড়াচ্ছে। তবু কোথায় কি আছে না আছে দেখবার জন্যে দু একদিন বেরুতে হল। ফলে কার্তিক মাসের রোদ লাগল মাথায়। খালের জলটাও সহ্য হল না। তৃতীয় দিনে একেবারে পুরোপুরি বিছানা নিলাম। দিন দুই যাওয়ার পরও যখন জ্বর গেল না, মাসিমা বললেন, 'ও-পাড়ার ভুবন ডাক্তারকেই ডাকি। অবশ্য সাধারণ জ্বর-জ্বারিতে আমাদের মধু কম্পাউণ্ডারও মন্দ নয়। কিন্তু তার দরকার নেই বাপু। শহরের বড় বড় ডাক্তারের ওষুধ খাওয়া নাড়ী তোমাদের. মধুর ও ওষুধ যদি না ধরে, মুশকিলে পড়ব। বড় ডাক্তার দেখানই ভাল।'

বললাম, 'ভুবন ডাক্তার বুঝি খুব বড় ডাক্তার তোমাদের?'

মাসিমা বললেন, 'বড় না? সেকালকার দিনের এম. বি. পাস। বিলেত যাওয়ার পর্যন্ত কথা উঠেছিল, যাননি। চমৎকার ডাক্তার, ওষুধ একেবারে ধন্বন্তরী। আর গরিব দুঃখীর ওপর খুব টান। নিজের বাড়িতে হাসপাতাল করেছেন। বিনা পয়সায় ওষুধপথ্য দেন। এ-মুল্লুকে এমন লোক নেই যে ভুবন ডাক্তারের নাম না জানে, গুণ না গায়।'

সুতরাং ভুবন ডাক্তারকেই ডাকা হল। জ্বরের ঘোরে দেখলাম একবার চেহারাটা। প্রায় ছ ফুট লম্বা শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের রং গৌর। গোঁফ দাড়ি কামানো, মাথার চুল সব পেকে গেছে। কিন্তু দাঁত দুতিনটির বেশি পড়েছে বলে মনে হল না। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। গলায় সাদা ধবধবে পৈতা দেখা যাচ্ছে, ওপরে কুচকুচে কালো স্টিথোস্কোপ।

মাসিমাই রোগের বিবরণ সব বললেন। ডাক্তার খানিকটা শুনলেন, খানিকটা শুনলেন না। একবার নাড়ীটা একটু ধরলেন। তারপর বললেন, 'জিভটা বার করুন তো।' করলাম। দেখে নিয়ে বললেন, 'হুঁ।'

তারপর আচমকা পেটে এক খোঁচা দিয়ে বললেন, 'ব্যথা লাগে?'

পেটে কোনো ব্যথা ছিল না, কিন্তু খোঁচায় যে সত্যিই ব্যথা পেয়েছি সেকথা আর তাঁকে বলি কিকরে?

বারান্দায় গিয়ে মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'ভাববেন না। আপনার চাকরকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দেবেন আমার ডিস্‌পেনসারিতে। ওষুধ নিয়ে আসবে।'

খসখস করে একটা কাগজে গোটা কতক ওষুধের নাম আর মাত্রা লিখলেন। তারপর চার টাকা ভিজিট নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বিদায় হলেন।

মাঝখানে আরো একদিন এসেছিলেন। সেদিনের বিবরণও ওই আগের দিনের মতই।

মাসিমার চাকরটি মুসলমান। বয়স বছর তের চৌদ্দ। নাম কলম। নিজে কোনোদিন কলম ধরেনি। কিন্তু লগি বৈঠায় খুব ওস্তাদ।

ডিঙি নৌকোয় গেলাম ভুবন ডাক্তারকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। আশীর্বাদসহ মেডিক্যাল সার্টিফিকেটখানা নিয়ে আসব—এও ছিল বাসনা।

ছোট ছোট খাল গেছে এঁকে বেঁকে। একটা থেকে একটা, তার থেকে আর একটা। দুই দিকে ঝোপ। কোথাও বা বাঁশের ঝাড়, সুপারির বাগান, গাব, শ্যাওড়া আর আগাছার জঙ্গল। মাঝে মাঝে দুচারখানা করে বাড়ি। ঘরগুলি তালাবন্ধ। কলম হেসে বুঝিয়ে দিল, 'হিন্দুরা ভয় পায়া পলাইয়াছে।'

আমাদের আগে পিছে অনেকগুলি ডিঙি নৌকো। কোনটিতে পার্টি, কোনটিতে হোগলা আর কোনটিতে শুধু একখানা কাপড় কি কাঁথা দিয়ে ছইয়ের আব্রু তৈরি করা হয়েছে। ভিতরে রোগিণী, আর গলুইতে লুঙ্গিপরা হুকো হাতে তার বাবা, কি স্বামী, কি ভাই। আর এক হাতে বৈঠা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় চলেছে ওরা?'

কলম বলল; 'আবার কোথায়, ভুবন ডাক্তারের বাড়ি। অনেক দূর দূরগুণা সব রুগীরা আসে।'

খানিক বাদে ভুবন ডাক্তারের বাড়িতে আমরাও পৌঁছলাম, কিন্তু নৌকো ভিড়বার জায়গা নেই ঘাটে। শুধু ঘাট নয়, বাড়ির চারদিকে ছোট ছোট কালো কালো সব ডিঙি নৌকো। বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গের গঞ্জগুলিতে যেমন হাট মেলে এও প্রায় তেমনি।

অনেক কষ্টে এক জায়গায় নৌকো ভিড়াল কলম। গলুইর ওপর থেকে একটু লাফিয়ে ডাঙায় নামলাম।

বেশ বড় বাড়ি। উত্তরের ভিটের পুরনো একতলা একটা দালান। আর তিনদিকে ঘিরে আটচালা ছনের ঘর। মাঝামাঝি একটা জায়গায় সাইনবোর্ড আঁটা। লেখা আছে—'নুরুন্নেসা হাসপাতাল'।

মুখুয্যে বাড়ির হাসপাতালের নাম নুরুন্নেসা। ব্যাপারটা কি! পাকিস্তান-সরকারের প্রীতি আর বিশ্বাস অর্জনের জন্যেই কি মুখুয্যে মশাইর এই নাম-নির্বাচন? কিন্তু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার তারিখ দেখছি তেরশ আটত্রিশ সাল। পাকিস্তান হওয়ার প্রায় ষোল বছর আগে। ভুবন ডাক্তারের দূরদৃষ্টি ছিল বলতে হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাইরের দিকের একটা ঘরে ভুবনবাবু তাঁর আউটডোর পেশেন্টদের দেখছিলেন, আমি গিয়ে হাজির হলাম। ডাক্তারবাবু একবার তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল আছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু ফের তাঁর রোগীদের নিয়ে পড়লেন, রোগ নির্ণয়ের প্রায় একই রকম প্রকরণ। কারো ম্যালেরিয়া, কারো কালাজ্বর, কারো অন্য কিছু।

আধ ঘন্টাখানেক বসে থেকে, আমি এবার একটু বিরক্ত হলাম। ভাল থাকলেই যে লোকের আরকোনো কথা থাকবে না, তার কি মানে আছে?

ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে একটু চড়া গলায় বললাম, 'ডাক্তারবাবু, আমি আজ চলে যাচ্ছি।'

আর একজন রোগীর নাড়ী টিপে ধরে ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো।' বললাম, 'আমি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট খানার জন্যে এসেছি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সার্টিফিকেট আবার কিসের?'

অবাক হলাম। সার্টিফিকেট কিসের মানে? ভিজিট আর ওষুধের দাম কিছুই তো বাকি রাখিনি? সার্টিফিকেটের জন্যে কি আরো টাকা আদায় করেন নাকি ইনি?

অপ্রসন্নভাবে দুটাকার একখানা পাকিস্তানি নোট ওঁর টেবিলে রাখলাম। যদি আপত্তি করেন, তখন না হয় আরো দুটো টাকা দেওয়া যাবে। কিন্তু আগে না।

ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন, 'টাকা কিসের?' বললাম, 'ওষুধের দাম সব ক্লিয়ার করে দিয়েছি। এ আপনার সার্টিফিকেটের টাকা। দুটাকায় হবে, না কি পুরো চার টাকাই লাগবে?'

হঠাৎ ডাক্তারবাবু উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি ভেবেছ কি? আমি টাকা নিয়ে সার্টিফিকেট দিই? এত স্পর্ধা তোমার? আমার বাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে অপমান কর! তোমার এত সাহস!'

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন মুসলমান আমাকে ঘিরে দাঁড়াল, 'কেডা আপনারে অপমান করবে, ডাক্তারবাবু, মানুষডা কেডা? মুহের কথাডা খসায়ন আপনে। মাথাডা খসাইয়া থুই।'

ডাক্তারবাবু হাতের ইশারায় তাদের সরে যেতে বললেন। তারপর আমার দেওয়া নোটখানা জোরে উঠানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, বেরোও এখান থেকে। সার্টিফিকেট আমি দিই না, কাউকে দিই না। যাও, চলে যাও।'

আমি উঠানে নেমে বললাম, 'বেশ না দিতে চান সেটা ভদ্রভাবে বললেই হত। কিন্তু বাড়ির ওপর পেয়ে যে অপমানটা মিছামিছি আপনি করলেন, আমি তা সহজে ভুলব বলে মনে করবেন না। যাওয়ার সময় থানায় রিপোর্ট করে যাব। তাতে কিছু না হয় ঢাকা করাচিকোনো জায়গা বাদ রাখব না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'যাও, যাও, থানা পুলিশ আমার খুব দেখা আছে।'

কলমকে নিয়ে ফের আমাদের সেই ডিঙি নৌকোয় উঠলাম। মাত্র খানিকটা এগিয়েছি, দু তিন খানা নৌকো আমাদের ঘিরে ধরল, 'ডাক্তারবাবু নিয়া যাইতে কইছে আপনারে।'

কলম ভয় পেয়ে বলল, 'কাম সারা, কয়েদ কইরা রাখবে। গুম কইরা ফেলবে একেবারে।'

ভয় আমিও যে না পেয়েছি তা নয়, তবু ফিরতেই হল।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, ডাক্তারবাবু ঘাটের কাছে হাতজোড় করে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, 'আমাকে মাফ্ করবেন। বুড়ো মানুষ,রাগের বশে কি বলে ফেলেছি কিছু ঠিক নেই। কিছু মনে করবেন না। আসুন, ওপরে আসুন।'

মনে মনে ভাবলাম থানা পুলিশের কথাটায় কাজ হয়েছে তাহলে, তাতে না হোক ঢাকা করাচির দোহাইতে হয়েছে।

বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আজই কলকাতা রওয়ানা হব।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিন্তু আজ তো আপনি আর লঞ্চ ধরতে পারবেন না। আপনাকে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আসুন, কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

নৌকো থেকে নামলাম। তিনি আমাকে তাঁর দালানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বললেন, 'আপনাকে তখন বলিনি। সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।' গলায় একটু যেন করুণ সুর বাজল।

চুপ করে রইলাম। আমি এই রকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম। ডাক্তারবাবু নিজেই সার্টিফিকেট পাননি। পাড়াগাঁয়ে শুধু হাত-যশেই কাজ চলে যাচ্ছে।

বললাম, 'কটা চান্স নিয়েছিলেন? একটা, না দুটো?'

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাশ করতে পারিনি, তা নয়, পাশ করেছিলাম, ভাল পাশের সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। কিন্তু তা রাখতে পারিনি।'

একটু চুপ করে রইলেন ডাক্তারবাবু। তারপর হঠাৎ বললেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনি আমার এখানে আজ এবেলার অতিথি। দুটি ডাল ভাত খেয়ে যাবেন।'

আমি আপত্তি করে বললাম, 'না না, সেকি। মাসিমা চিন্তায় থাকবেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না। নাস্তা দিয়ে আমি আপনার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে গিয়ে সব খবর দেবে।'

দালানের ভিতরে ঢুকলাম। অনেক দিনের পুরনো বাড়ি। দরজার উপরে ডাক্তারবাবুর বাবা-মার বাঁধানো ফটো। চেহারার মিল দেখে অনুমান করলাম।

মাঝখানের একটা কামরায় ঢুকে ডাক্তারবাবু স্ত্রীর উদ্দেশে ডেকে বললেন, 'ওগো, শোন, এদিকে এস। আরে, এ আমাদের ছেলের মত। এর কাছে আবার লজ্জা কি! ও পাড়ার বোস-ঠাকরুণের বোনপো। কি যেন নাম বলেছিলেন সেদিন?'

'কল্যাণকুমার রায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ; কল্যাণ, কল্যাণ। আর বলবেন না মশাই, পরম অকল্যাণ ঘটিয়ে ফেলেছিলাম আর একটু হলে। মেজাজটা আর ঠিক হল না।'

একটি মহিলা এসে দোরের কাছে দাঁড়ালেন। চওড়াপেড়ে আটপৌরে একখানা শাড়ি পরনে। গায়ে সামান্য দু একখানা গয়না। মাথায় আঁচল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। রঙ কালো। মুখের ডৌলও সুন্দর বলা যায় না। তবে ডাক্তারবাবুর তুলনায় বয়স অনেক কম বলেই মনে হল। চল্লিশের বেশি হবে না।

মহিলাটি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু আগে অত চেঁচামেচি করছিলে কেন?'

স্বর মৃদু কিন্তু মিষ্টি।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আর বল না, আজ একটা কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল। স্বভাবটা আর শোধরাতে পারলাম না।'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটু হাসলেন, 'আর কবে পারবে?'

একথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কল্যাণবাবু আজ আমাদের অতিথি। আমি ওঁকে কেবল তেতো তেতো ওষুধ আর ইনজেকশন দিয়েছি, তুমি একটু পথ্যটথ্যের ব্যবস্থা কোরো। আমি যাই, রোগীরা সব বসে আছে।'

তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু মশাই আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না। আমার ফিরতে ফিরতে বেলা তিনটে।'

বলে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আমার সঙ্গে আরো দু একটা কথা বলে ভিতরে চলে গেলেন। আমি ওঁদের বসবার ঘরে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে খানিকক্ষণ ডাকের বাসি খবরের কাগজ ওল্টালাম। কাচের আলমারি ভরা যে সব বই দেখলাম তার সবই চিকিৎসাশাস্ত্র। ম্যাগাজিনগুলিও তাই।

একটু বাদে ফের এলেন মহিলাটি। নিজেই চা বানিয়ে এনেছেন।

খুশি হয়ে বললাম, 'আপনি নিলেন না?'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমরা নিজেরা কেউ চা খাইনে।'

খানিক বাদে স্নানাহার সেরে নিতে হল। একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হল ফের সেই বিকেল পাঁচটায়। ছোট গড়গড়াটা হাতে নিয়ে তিনিই আমাকে ডেকে তুললেন, বললেন, 'উঠুন। কার্তিক মাসের দিনে এত ঘুম ভাল নয়, মাথা ধরবে।'

আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এসে আমার সামনে। হেলান দিয়ে নয়, মেরুদণ্ড সোজা করে স্থির হয়ে বসলেন। আমি ইঁদারার জলে হাতমুখ ধুয়ে এলাম। তারপর ফের এক কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনলাম ওঁর গল্প। ভুবন ডাক্তারের সার্টিফিকেট হারাবার কাহিনী। সে কাহিনী ডাক্তারবাবু নিজের মুখে উত্তমপুরুষে বলেছিলেন, ফরিদপুরের ভাষায়। কিন্তু কলমের মুখে তাঁর কথাগুলিকে ঠিক ঠিক তুলে দিলে নানা অসুবিধে হবে ভেবে আমি কেবল তাঁর কথিত বস্তুটিকেই ধরে দিলাম।

মেডিসিনে গোল্ড মেডাল নিয়ে ভুবনমোহন যখন মেডিকেল কলেজ থেকে বেরুল তখন তার বয়স ছাব্বিশ। তখনও নামের সঙ্গে চেহারার বেশ মিল। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, টানা টানা নাক চোখ। মাথায় ঘন কালো চুল। ঠোঁটের ওপর সুন্দর সুকৃষ্ণ একটি গোঁফ। কিন্তু মুখে স্বাভাবিক প্রসন্ন হাসিটুকু নেই। কারণ মাস তিনেক আগে বাবা মারা গেছেন। আর মাত্র অল্প কদিনের জন্যে তিনি ভুবনের সাফল্যের খবরটুকু শুনে যেতে পারলেন না। অথচ এই দিনটির জন্যে তিনি ছ বছর ধরে অপেক্ষা করেছেন। শুধু ছ বছর কেন, ষোল বছরও বলা যায়। ভুবনের স্কুলের গোড়ার ক্লাসগুলি থেকেই তাঁর সেই প্রতীক্ষা। তখন থেকেই তিনি ভুবনকে জিজ্ঞেস করতেন, 'আচ্ছা বলতো খোকা, বড় হয়ে কি হবে তুমি? জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার—কি হতে চাও বল।'

বাবার ইচ্ছে যে ডাক্তার হওয়া, তা তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন। তবু জজ, ম্যাজিস্ট্রেট শব্দগুলির দিকে মাঝে মাঝে লোভ যেত ভুবনের। রোজই কি আর এক ডাক্তার হতে ভাল লাগে!

কিন্তু পরে যখন আরো বড় হল, বাবার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে একেবারে মুদ্রিত হয়ে গেল। না, ডাক্তার ছাড়া ভুবন আর কিছু হবে না। ডাক্তার—বড় ডাক্তার।

জমিদার বাড়ির চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির সাধারণ একজন কম্পাউণ্ডারের ছেলের বড় ডাক্তার হওয়া বড় সোজা ব্যাপার নয়। এই নিয়ে ভুজঙ্গমোহনকে পাড়া-প্রতিবেশী সহকর্মীদের কাছে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। গোড়ার দিকে ভুবনের স্টাইপেণ্ডের টাকায় কিছু কিছু এগিয়ে গেলেও ভুজঙ্গমোহনকে পরে অনেকের কাছে হাত পাততে হয়েছে, অনেক রকম সাহায্য নিতে হয়েছে। ধার-দেনাও কম হয়নি। সে ধার যে শুধু হাতে জুটেছে তা নয়। সামান্য যা কিছু জোত জমি ছিল, যে কখানা গয়না ছিল স্ত্রীর

গায়ে, সব বন্ধক পড়েছে, সব কিছুর বদলে এই সোনার মেডাল। তবু এই মেডাল দেখা তাঁর ভাগ্যে ঘটল না ভেবে মনে মনে বিমর্ষ হল ভুবন।

মা লিখেছেন, ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে আসবে। কিন্তু তার আগে আরো একজনকে মেডালটা দেখিয়ে আসা দরকার। প্রীতিলতাকে। ব্যারিস্টার নগেন বাঁড়ুয্যের মেয়ে প্রীতিলতা। বেথুন কলেজ থেকে গতবার বি. এ. পাস করেছে।

তাদের ভবানীপুরের বাড়িতে বাবাই একদিন নিয়ে গিয়েছিলেন ভুবনকে। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সে বাড়িতে দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর দরিদ্র ছাত্র হিসাবে ভুবন বছর দুই স্থানও পেয়েছিল। তখন থেকেই আলাপ। তারপর মেডিক্যাল মেসে এসে আশ্রয় নেয় ভুবন। কারণ, তাকে বেশি দিন নিজের বাড়িতে রাখা নগেনবাবু যে পছন্দ করছেন না, তা ভুবন টের পেয়েছিল। আর টের পাওয়ার পর সেখানে থাকাটা নিজের সম্মান-রক্ষার পক্ষে মোটেই তার অনুকূল মনে হয়নি, তবু যাতায়াত দেখাশোনা মাঝে মাঝে, এমন কি, সপ্তাহে সপ্তাহে চলেছে। বাড়ির অন্য সব যুবক আগন্তুকদের তুলনায় ভুবনের ওপরই যে প্রীতির পক্ষপাতিত্ব বেশি, তাও কারো অজানা থাকেনি।

ভুবনের মেডাল দেখে প্রীতির বাবা-মা খুব খুশির ভাব দেখালেন। কিন্তু প্রীতির খুশিটা নিজের চোখে দেখল ভুবন।

একটা নির্জন ঘরে প্রীতি ভুবনকে ইশারা করে ডেকে নিয়ে গেল, তারপর বলল, 'কই, দেখি কি মেডাল পেয়েছ ?'

ভুবন স্মিতমুখে মেডালটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে। প্রীতি তার সুন্দর ছোট মুঠির মধ্যে মেডালটাকে লুকিয়ে বলল, 'যদি আর না দিই ?'

ভুবন বলল, 'আমিও তো তা-ই চাই। ওটা তোমার কাছেই থাকুক।'

আলাপে ব্যাঘাত ঘটল। দোর ঠেলে আর একটি যুবক এসে ঘরে ঢুকল, 'প্রেটি, তুমি এখানে ? আর আমি সারা বাড়ি ভরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি !'

অরুণ চক্রবর্তী বিলেত থেকে সদ্য ব্যারিস্টারি পাস করে এসেছে। হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা ওর বাবার খান দুই বাড়ি আছে কলকাতা শহরে, আর ব্যাঙ্কে টাকা। প্রীতিদের চাইতে আর্থিক আভিজাত্যে ওরা অনেক বড়। তবু যে প্রীতির ওপর তার হৃদয় এতখানি উন্মুখ হয়ে উঠেছে, প্রীতির বাবার ধারণা, তা শুধু অরুণের সহৃদয়তার জন্যেই। নইলে ওদের সমাজে প্রীতির মত অমন শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের তো অভাব নেই !

ভুবনকে দেখে অরুণ 'সরি' বলে ভদ্রতার ভান করে চলে আসছিল, প্রীতিই তাকে ডাকল, 'দেখ, ভুবন কেমন সুন্দর একখানা মেডাল পেয়েছে।'

অরুণ বলল, 'তাই নাকি ! কিন্তু বিষয়টা তোমার কাছে যেমন নতুন লাগছে, আমার কাছে তেমন মনে হচ্ছে না। বছর বছর ছাত্রেরা অমন অনেকগুলি করে মেডাল পায়। ছাত্র বয়েসে আমিও কম পাইনি।'

বলে অরুণ বেরিয়ে আসছিল, মেডালটা তাড়াতাড়ি ভুবনের হাতে গুঁজে দিয়ে প্রীতি

বেরিয়ে এল তার পিছনে পিছনে। অরুণকে চটাতে তার সাহস নেই। তাতে বাবা চটবেন।

ভুবন সবই বুঝল। অলক্ষ্যে এক সময় বেরিয়ে এল ব্যারিস্টারের বাড়ি থেকে। এক মুহূর্তও তার আর কলকাতায় থাকবার ইচ্ছে রইল না।

তবু মায়ের সঙ্গে দেখা করে ফের আসতে হল কলকাতায়। মেডিক্যাল কলেজে হাউস সার্জন থাকতে হবে মাস কয়েক। ছ মাসের জায়গায় বছর খানেক রইল। আরো কবার ঘোরাঘুরি করল ভবানীপুরে। কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। প্রীতির বাবা-মা অরুণের পক্ষে। প্রীতির যুক্তি-বুদ্ধির সায়ও সেই দিকে। শুধু অবুঝ মন মাঝে মাঝে একটু কেমন কেমন করে। কিন্তু সেই কেমন করার ওপর আর কতখানি নির্ভর করা যায়।

তবু প্রীতি একদিন ভুবনকে ডেকে বলল, 'তুমি একবার বিলেত থেকে ঘুরে আসতে পার না ? বাবা বলছিলেন, শুধু এখানকার একটা সার্টিফিকেটের কী মূল্য আছে ?'

বিলাত যাওয়ার স্বপ্ন ভুবনের মনেও ছিল। সরকারি বৃত্তিটা যাতে জোটানো যায়, তার জন্যে চেষ্টা-চরিত্র কম চলছিল না। অধ্যাপকেরা যথেষ্ট সাহায্য করছিলেন। কিন্তু প্রীতির কথার ভঙ্গিতে ভুবনের মন বেঁকে দাঁড়াল, রূঢ়স্বরে বলল, 'তোমার বাবার মতামতটা আমার কাছে খুব মূল্যবান নয়। তুমি নিজে কি বল ?'

প্রীতি বলল, 'কেন, বাবা কি এমন অন্যায় বলেছেন ? বাইরের ডিগ্রি ছাড়া প্রেস্টিজ বাড়ে নাকি ?'

ভুবন জবাব দিল, 'বাইরে যদি যাই, প্রেস্টিজের লোভে যাব না, শিক্ষার জন্যেই যাব। তোমার বাবাকে বলে দিয়ো কথাটা।'

প্রীতি না বললেও কথাটা তার বাবার কানে গেল। তিনি মুখ গম্ভীর করে মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করে ফেললেন।

কি একটা কারণে বৃত্তিটা ভুবনের হাত থেকে ফসকে গেল। অরুণের সঙ্গে প্রীতির এনগেজমেন্টের খবরটা যথাকালে ভুবনের কাছে পৌছল। এত তাড়াতাড়ি এসব ঘটবার কোনো কথা ছিল না। প্রীতির বাবার জেদের জন্যেই যে এমন হয়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু প্রীতিকেও ভুবন ক্ষমা করতে পারল না। প্রীতির কি বয়স হয়নি, সে কি লেখাপড়া শেখেনি ? তার কি কোনো স্বাধীন মতামত নেই ? সে কি তার বাবার হাতের একটি রঙিন খেলনা ? স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মত তাদের ওই ছোট সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে ঘুর ঘুর করে বেড়াবার জন্যেই কি তার সৃষ্টি ? এতদিনের এত প্রতিশ্রুতি, এত আশ্বাস, এত বৈপ্লবিক কল্পনা, বাঁধ ভেঙে বেরুবার এত সাধ—সব এত সহজে মিথ্যে হয়ে গেল ? এতদিন ধরে প্রীতি কি তার সঙ্গে শুধু ছলনা করেছে ? সমস্ত মেয়েজাতটার ওপর ঘৃণা আর বিদ্বেষে মন ভরে উঠল ভুবনমোহনের। কলকাতা শহরটাকে মনে হল রসহীন রঙহীন ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়া আরব্য মরুভূমি। কোথাও কোনো জায়গায় মরুদ্যানের চিহ্নমাত্রই নেই।

আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার বাবার উপদেশের কথা। 'পাশ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে শহরে থেকো না, গাঁয়ে চলে এস। শহরে তো ডাক্তার কবরেজের অভাব নেই। কিন্তু বিশ পঁচিশ গ্রাম খুঁজলেও একজন বড় ডাক্তার বের করা যাবে না। সবাই আমার মত

কম্পাউন্ডার, আর না হয় হাতুড়ে। শহরে কে কাকে চেনে ? কিন্তু এখানে একবার পশার জমিয়ে বসতে পারলে দেশ সুদ্ধু নাম-যশ ছড়িয়ে পড়বে। লোকে বলবে ভুজঙ্গ মুখুয্যের ছেলে যাচ্ছে। তা ছাড়া গাঁয়ের গরিব-দুঃখীর উপকারও করা হবে। এত কষ্ট এত পরিশ্রম বৃথা যাবে না। ধর্মও, হবে, অর্থও হবে। মুখ উজ্জ্বল হবে পিতৃপুরুষের।'

মনে মনে অনুতাপ হল ভুবনের। সেই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে বলেই তার ভাগ্যে এই দুঃখ, এই বঞ্চনা। সঙ্কল্পের কথা বন্ধুদের জানাল ভুবন, 'এখানে আর নয়। আমি গ্রামে গিয়ে প্র্যাকটিস করব ঠিক করেছি।'

বন্ধুরা হেসে উঠল—'বল কি হে ! পাগল না মাথা খারাপ, শহরে বর্তমান না থাকলেও ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু গ্রামে গেলে যে ভূত হয়ে যাবে। এখানে ব্যারিষ্টার-কন্যা না জুটুক উকিল-মুহুরীর কন্যাদের নেহাত অভাব হবে না। কিন্তু গ্রামে নোলক-পরা পাঁচী-পদী ছাড়া যে কিছু জুটবে না কপালে।'

বন্ধুদের প্রগল্‌ভ পরিহাসে কান না দিয়ে মন স্থির করে ফেলল ভুবন। সোজা চলে এল গ্রামে। মাকে বলল, 'আমি এখন থেকে এখানেই থাকব। আমাদের বৈঠকখানা ঘরে ডিসপেনসারি খুলব, মা। বাবারও সেই ইচ্ছেই ছিল।'

মা বললেন, 'কিন্তু এখানে কি কেউ তোকে ডাকবে ? মান মর্যাদা দেবে কেউ ? অন্তত একটা মহকুমা শহর টহরে—'

ভুবন মাথা নেড়ে বলল, 'না শহরেও না, মহকুমাতেও নয়। হয় এখানে, না হয় কলকাতায়।'

মা একটু চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে এখানেই বোস। যে কদিন আছি, থাক আমার চোখের সামনে। বড়লোক হওয়া আমাদের কপালে নেই, তা আমরা হবও না। মায়ে পোয়ে কাছাকাছি যদি থাকতে পারি সেই ভাল। এখন দেখে শুনে একটা বিয়ে থা কর।' বিরক্ত হয়ে ভুবন ধমক দিল মাকে, 'ও সব কথা বাদ দাও, ও সব কথা পরে হবে।'

কিন্তু আদর্শের অনুসরণ কল্পনায় যত সহজ মনে হয়েছিল, বাস্তবে তেমন হল না। পাড়াপড়শিরা, চাটুয্যেরা, বাঁড়ুয্যেরা, দত্তেরা, চৌধুরীরা সবাই কানাঘুষা করতে লাগল—কলকাতায় ডিসপেনসারি দিয়ে বসবার পয়সা জুটছে না বলেই ভুবনের এই দেশপ্রীতি। তা ছাড়া শুধু কি কাগজে কলমে ভাল ছেলে হলেই হয়, ডাক্তারিটা হাতে-কলমের বিদ্যে। পশার জমাতে হলে সাহস চাই, বুদ্ধি চাই, ক্ষমতা চাই আলাদা জাতের।

বছর খানেক কেটে গেল। এর মধ্যে দু চারটি ছাড়া কল পেল না ভুবন। তাও পুরো ভিজিট আদায় হল না। ও পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তার নন্দ দাস ঠিক আগের মতই আসর জাঁকিয়ে রইল। বন্ধকী জমিগুলি একটার পর একটা বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সবই ভাগ্য ! এবার কি একটা চাকরি-বাকরি খুঁজবি ! সরকারি হাসপাতালগুলিতে দেখবি চেষ্টা-চরিত্র করে ?'

ভুবন গম্ভীর মুখে বলল, 'দেখি ভেবে।'

কিন্তু ভাববার অবকাশই কি সব সময় মেলে ? রোগীহীন শূন্য ডিসপেনসারিতে ভুবন

সেদিন আগাগোড়া ব্যাপারটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিল, ফতুয়া গায়ে, কপালে তিলক-কাটা, পাশের গাঁয়ের হরিচরণ কুণ্ডু এসে হাজির হল, 'এই যে বাবাজী, বাড়িতেই আছ দেখছি।'

ভুবন বলল, 'হ্যাঁ, কলে এখনো বেরুই নি। তা কি ব্যাপার কুণ্ডুমশাই ? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ আছে না কি ?'

হরিচরণ বলল, 'না বাবাজী, মহাপ্রভুর কৃপায় দেহ সকলের সুস্থই আছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই।'

ভুবন বলল, 'কেন বলুন তো ?'

হরিচরণ বলল, 'না, বাবাজী, মহাপ্রভুর পত্র একেবারে বন্ধ হয়ে গেল যে। এই তো সেদিন ফতেপুরের কাছে লবণের নৌকোটা অমন করে ডুবে গেল। যাকে বলে একেবারে ঘাটে এসে ভরাডুবি। একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছি বাবাজী। আমার টাকা কটা এবার ফেলে দাও। আর তো দেরি করতে পারিনে। তা হলে উপোস করে মরব।'

তার পড়ার খরচ যোগাবার জন্যে এই মহাজনের কাছ থেকেও শ পাঁচেক টাকা ভুবনের বাবা এক সময় ধার নিয়েছিলেন। ভুবনের হিসেব মত তার শ তিনেক টাকা শোধ দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু হরিচরণ বলে, সে সব গেছে সুদের থেকে। আসলটা পুরোপুরিই রয়ে গেছে। টাকাটা তো আর কম দিন ফেলে রাখেনি হরিচরণ। ভুবন বলল, 'আচ্ছা, আজ তো যান আপনি।'

হরিচরণ বলল, 'আজ যাচ্ছি। কাল বাদে পরশু দিনই কিন্তু আমি আবার আসব। তুমি এর মধ্যে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা রেখো। না হলে আমি আর পারব না।'

ভুবন বলল, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

টেবিলের ওপর পা তুলে আর গালে হাত দিয়ে ফের ভাবতে বসল ভুবন। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না, বিটের পিওন এসে ডেকে তুলল, 'ঘুমুচ্ছেন নাকি ডাক্তারবাবু ? চিঠি আছে আপনার।'

খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে রঙিন চিঠিখানা বের করল ভুবন। দার্জিলিং থেকে প্রীতি লিখেছে, 'অরুণকে যত অনুদার ভেবেছিলাম আসলে সে তা নয়। বিয়ের পর থেকে সে প্রায়ই বলছে তোমার কথা। বিশেষ করে এখানে এসে সে রোজই তোমাকে আসতে বলছে। এই চিঠিও তার অনুরোধেই লেখা। সত্যি, কদিনের জন্যে এসোনা এখানে ? আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে না হয় কদিন থাকলেই বা। দোষ কি ? যা ঘটে গেছে তা তো ঘটে গেছে। ব্যাপারটাকে Sportsman-এর মত নেওয়াই ভাল। জীবনে খেলার মাঠে গেলে না। এবার জীবনটাকেই খেলার মাঠ হিসেবে দেখতে শেখ।

আর একটা কথা। গাঁয়ে গিয়ে অমন করে অজ্ঞাতবাস করছ কেন ? কেন জীবনটাকে নষ্ট করছ ? লোকে বলে নাকি আমার জন্যেই। ছি ছি ছি ! আমি লজ্জায় আর বাঁচিনে। পুরুষ মানুষের কি এমন আত্মহত্যা সাজে ! সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় যাও। আর তার আগে এস এই দার্জিলিং-এ। দেখ এসে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় সূর্যোদয়। মনের সব অন্ধকার

ঘুচাবে।

কোনো রকমে গাড়ি-ভাড়াটা জুটিয়ে চলে এসো। আর কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না।'

চিঠিটা মুচড়ে ঘরের কোণে ফেলে দিল ভুবন।

তবু তার প্রত্যেকটা লাইন যেন ছুঁচ হয়ে বিঁধতে লাগল ভুবনের গায়ে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যুক্তি করে নিশ্চয়ই এই চিঠি লিখেছে। ভুবনকে উপহাস করার জন্য, তাকে আঘাত দেওয়ার জন্যেই প্রীতির এই চেষ্টা। আত্মহত্যা! হয়ে গেছে ভুবনের তার জন্যে আত্মহত্যা করতে। বরং প্রীতিকে যদি সে সামনে পেত একবার, নারীহত্যা করে দেখত হাতের সুখ মিটিয়ে। হ্যাঁ, প্রীতিকে সামনে পেলে সে নিশ্চয়ই হত্যা করত। শোধ নিত সব জ্বালার, সব অপমানের।

দুপুর গেল, বিকেল গেল, উতরে গেল সন্ধে; অশান্তি আর অস্বস্তি যেন আর কাটে না ভুবনের। দুখানা মুখ কখনো পর পর, কখনো পাশাপাশি ভেসে উঠতে লাগল ভুবনের চোখের সামনে। হরিচরণ কুণ্ডু আর প্রীতি। এখন প্রীতিলতা চক্রবর্তী। মুখের আদল একজনের গোল, একজনের লম্বা। কিন্তু ভিতরটা একরকম, দুজনেই শঠ, দুজনেই শয়তান। ওদের দুজনের বিয়ে হলে বেশ হত। সেই অপূর্ব মিলনদৃশ্যটা কল্পনা করে নিজের মনেই হেসে উঠল ভুবন ডাক্তার।

আর একটু বাদেই দেখা মিলল তৃতীয় একখানা মুখের। ঘন কালো চাপ দাড়িতে সে মুখ আচ্ছন্ন, তবু তার হিংস্রতা যেন একটুও চাপা পড়েনি। একটা চোখ না থাকায় সে মুখের বীভৎসতা আরো বেড়েছে।

পরনে লুঙ্গি, গায়ে মেরজাই, হাতে সাধারণ একখানা ছড়ি, সেখপাড়ার জনাব আলী খাঁ এসে ঘরে ঢুকল, 'এই যে ডাক্তারবাবু, নিজে নিজেই হেসে কুটি-পাটি। খোয়াব দেখছেন নাকি? দুনিয়ার কোন্ রঙ্গ তামাসা দেখলেন খোয়াবের মধ্যে?'

ভুবন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আসুন খাঁ সাহেব, বসুন এসে, অসুখ বিসুখ আছে নাকি বাড়িতে? এত রাত্রে যে? ব্যাপার কি?'

এর আগে জনাব আলীই তাকে বার দুই কল্ দিয়েছে। তাই ভুবন খুব খাতির করল জনাবকে।

চেয়ারটা এগিয়ে দিল সামনে।

জনাব আলী চেয়ারটায় বসে বলল, 'অসুখ বিসুখ তো আছেই, বিনা অসুখে কি কেউ ডাক্তারের বাড়ি আসে? বড় শক্ত ব্যামো ডাক্তার, বড় শক্ত ব্যামো। সারিয়ে দিতে পারলে'—হাতের পাঁচটা আঙুল উঁচু করে দেখাল জনাব; মুখেও বলল, 'পাঁচ শ' টাকা। তোমাদের মায়ে-পোয়ের সংসার। পুরো একটা বছর পায়ের ওপর পা তুলে বসে বসে খাবে। রোজগারের চেষ্টা করতে হবে না।'

ভুবন বলল, 'তা তো বুঝলুম। অসুখটা কি?'

জনাব আলী বলল, 'বলছি।'

তারপর বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে ডেকে বলল, 'ও মনাই, ঘরে আয়। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলি নাকি? দুঃখে সরমে ছেলেটা একেবারে মনমরা হয়ে রয়েছে ডাক্তার। কাউকে মুখ দেখাতে চাইছে না, আয় মনাই, ঘরে আয়। ডাক্তারবাবুর কাছে সব খুলে বল।'

জনাই খাঁর ছেলে মনাই খাঁ এল ভিতরে। তাকেও একটা চেয়ার দিল ভুবন। চব্বিশ পঁচিশ হবে মনাইর বয়স। কালো শক্ত সমর্থ চেহারা। মুখের আদলটা বাপের মত। চাপ দাড়ির বদলে নূর আছে থুতনিতে।

ভুবন ভাবল ওরইকোনো গোপন অসুখ বিসুখের কথা হবে বুঝি, ঘরে স্ত্রী থাকলেও বাপ-বেটা দুজনেরই দুশ্চরিত্রতার অপবাদ আছে।

ভুবন বলল, 'কি, তোমার অসুখটা কি মনাই? এখানে তোমার বাজানের সামনে বলবে, না ভিতরে যাবে?'

বাপের ইশারায় মনাই খাঁ কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'নুরু আমাকে নাথি মেরেছে ডাক্তারবাবু। এলোপাথারি নাথি মেরেছে।'

ভুবন বিস্মিত হয়ে বলল, 'নুরু! নুরু কে?'

জনাই খাঁ উঠে এসে ভুবনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চল, ডাক্তার, তোমার ভিতরের কামরায় চল। আমি সব বলছি। ও এক ফোঁটা ছেলে। ওর কি সব কথা গুছিয়ে বলবার বুদ্ধি হয়েছে!'

জনাই খাঁকে নিয়ে ভুবন উঠে এল পাশের কামরায়, তারপর তার সব কথা মন দিয়ে শুনল।

নুরু মানে নুরুন্নেসা। জনাই খাঁর উনিশ কুড়ি বছরের ভাইঝি। মৃত জমির আলী খাঁর একমাত্র মেয়ে। খাঁ-দের মাঠের এক শ বিঘা জমির অর্ধেক অংশীদার। এত সম্পত্তির মালিক হয়ে মেয়েটার মাথা বিগড়ে গেছে। না হলে চাচার কথা অমান্য করে! যে চাচা কোলে পিঠে করে তাকে মানুষ করেছে, ভাল-মন্দ খাইয়েছে পরিয়েছে। জনাই খাঁ ভাল প্রস্তাবই করেছিল, 'আমার মনাইকে তুই সাদি কর নুরু। দুজনে মিলে মিশে বাড়িতে এক ঘরে থাকবি। আমার মাঠের জমিও ভাগ হয়ে অন্যের চাষে যাবে না।'

কিন্তু নুরুন্নেসার সে কথা পছন্দ হল না, সে জিভ কেটে বলল, 'তুমি কও কি চাচা! মনাইরে আমি তো সে চোখে দেখিনি।'

আরে সম্পর্ক বদলালে চোখ বদলাতে কতক্ষণ লাগে? কিন্তু মেয়েটা আসলে দজ্জাল। সব ওর বদমাশি। প্রথমে সাদি বসল হোসেনপুরের আফাজদ্দি সেখের সঙ্গে। সে যতদিন ছিল, মোটেই সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করেনি। দজ্জাল মেয়েটার স্বভাব তো ভাল নয়। মারপিট ঝগড়াঝাঁটি খুব চলত। তারপর আফাজদ্দি মরে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এখন জনাই খাঁ ফের তুলেছে সেই প্রস্তাব। সাদি কর মনাইকে। মনাইর আগের যে বউটা আছে, তাকে তালাক দিতে কতক্ষণ! ছেলেপুলের ঝামেলা তো কারোরই নেই, মনাইরও না, নুরুন্নেসারও না। তাই এ দিকে সেই প্রথম বয়সের সাদির মতই মধুর হবে। কিন্তু বদমাশ

মেয়েটা এবারও গররাজি। বলে, 'না, আমি আর নিকে সাদির মধ্যে নেই।' অথচ ভিন্ গ্রাম থেকে দু একটি করে বিয়ের সম্বন্ধ ওর আসছেই। আনাগোনা চলছে ঘটকের। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ও নিজেই তাদের সঙ্গে কথা বলছে। ঘুরঘুর করছে সুন্দর সুন্দর সব তরুণের দল। নুরু তাদের অনেকের সঙ্গেই নষ্ট। নিজের চোখের ওপর সব সহ্য করতে হচ্ছে জনাই খাঁকে। মনাইকে পাঠিয়েছিল একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে, বলতে, সাবধান করে দিতে। নুরু তাকে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। মেয়েমানুষের এই বেলেল্লাপনা কি সহ্য করতে হবে ?

ভুবন ডাক্তার কি বলে ? সংসারে যত দুর্গতি, যত দুঃখকষ্টের মূল এই মেয়েমানুষ। এ কথায় কি ভুবন ডাক্তারের সায় নেই ?

ভুবন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আমি এর কি করতে পারি ?'

করতে পারে বই কি। ডাক্তারের এতে কিছু করবার আছে বলেই তো জনাই খাঁ এত রাতে তার কাছে ছুটে এসেছে। কদিন ধরে নুরুন্নেসা জ্বরে বড় কাতর। গায়ে পায়ে ব্যথাও আছে। তার জন্যেই দাওয়াই নিতে এসেছে জনাই খাঁ। এমন দাওয়াই কি ডাক্তারের আলমারিতে নেই, যাতে সব দুঃখ, সব জ্বালার শান্তি হয় ? এক সঙ্গে সকলেই জুড়োতে পারে ?

ভুবন শিউরে উঠল, 'তুমি বলছ কি খাঁ সাহেব ?'

জনাই খাঁ বলল, 'আস্তে ডাক্তার, আস্তে। ঠিক কথাই বলছি। দাওয়াই তুমি না দাও, আর কেউ দেবে। কিন্তু তোমাকে আর জীবনে দাওয়াই দিতে হবে না। তোমার দাওয়াই আমিই আজ রাত্রে বাতলে দিয়ে যাব।'

বলে জামাটা তুলে ফেলে একখানা ছোরা বার করল জনাই খাঁ। আর একদিক থেকে বার হল এক তাড়া নোট।

তারপর জনাই খাঁ হেসে বলল, 'নাও ডাক্তার, বেছে নাও যা তোমার পছন্দ।'

মিনিট কয়েক স্তব্ধ হয়ে থেকে ভুবন বলল, 'কিন্তু একথা যদি কেউ জানতে পারে ?'

জনাই খাঁ একটু হাসল, 'ক্ষেপেছে ডাক্তার ? এসব কাজ কি জনাই খাঁর নতুন যে, কেউ জানতে পারবে ? কাক পক্ষীটিও জানতে পারবে না। কাঁচা বয়স থেকে জনাই খাঁ কোনোদিন কাঁচা হাতে কাজ করেনি। আর এখন তো হাত পেকে গেছে। তোমাকে কষ্ট দিতাম না ডাক্তার, নিজের হাতেই সব দিতাম শেষ করে। কিন্তু নেহাত কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, তাই। আজ থেকে তুমি আমার ডান হাত হয়ে রইলে ডাক্তার, দোস্ত বলে। তোমারকোনো ভাবনা নেই আর।'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'কত আছে এখানে ?'

জনাই খাঁ বলল, 'পাঁচ শ।'

ভুবন বলল, 'পাঁচ শতে কি হবে ! আমার ওষুধের দাম পাঁচ হাজার।'

জনাই খাঁ হেসে বলল, 'সাবাস, সাবাস ! এই তো ঠিক দোস্তের মত কথা বলছ, কোলাকুলি হচ্ছে সেয়ানে সেয়ানে। তুমি যা চাইছ, তাই দেব ডাক্তার। তবে এক সঙ্গে পারব

না। ক্রমে ক্রমে। আজ এই রাখ। কাল আবার ফের পাঁচ শ। ভালয় ভালয় সব চুকে যাক। তোমার সব পাওনা মিটিয়ে দেব, জনাই খাঁর জবান কেউ অবিশ্বাস করে না। সঙ্গী-সাকরেদদের কাউকে এক পয়সা ঠকায় না জনাই খাঁ। তাহলে কি কারবার চলে ডাক্তার ?'

ভুবন নোটের তাড়াটা কম্পিত হাতে টেনে নিল। হ্যাঁ, জনাই খাঁর দোস্তই সে হবে, সেই ভাল। এ ছাড়া তার আরকোনো গতি নেই।

খানিক বাদে ওষুধের শিশি নিয়ে জনাই খাঁ আর মনাই খাঁ বাড়ি গেল।

যাওয়ার আগে জনাই খাঁ বলল, 'শেষ রাত্রের মধ্যেই সব মিটে যাবে তো ? আমি আর সব ঠিক করে রেখেছি। যত গোলমাল মাটির ওপরে। মাটির তলে আরকোনো গোলমাল নেই ডাক্তার। সেখানে সব শান্তি। আজ রাত্রেই সব মিটবে তো ?'

ভুবন ডাক্তার ফের ঘাড় নেড়ে সায় দিল, 'আজ রাত্রেই সব মিটে যাবে।'

রাত্রে খেতে গিয়ে খেতে পারল না ভুবন ডাক্তার, ঘুমুতে গিয়ে ঘুম এল না। সারা রাত এপিঠ-ওপিঠ করতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে মা বললেন, 'তোর কি বায়ুচড়া হয়েছে নাকি ভুবন ? না কি ছারপোকা কামড়াচ্ছে ?'

ছারপোকার চেয়েও যে শক্ত বিষাক্ত পোকায় ভুবনকে কামড়াতে শুরু করেছে, সেকথা আর সে মাকে জানাল না।

পরদিন বেলা নটা দশটার সময় সেখ-পাড়ায় গোলমালটা খুব জোর শোনা গেল।

তার অনেকক্ষণ আগেই কবর দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে জনাই খাঁ আর মনাই খাঁ দুজনেই জল মুছল। বাড়ির মেয়েরাও কাঁদছে উচ্চ চিৎকারে। এই সময় থানা থেকে দারোগা আর কয়েকজন পুলিশ-সেপাইকে নিয়ে এল লতিফ সিকদার। লতিফের সঙ্গেই সম্বন্ধ এসেছিল নুরুন্নেসার। আনাগোনাও চলছিল তার সঙ্গে কিছুদিন ধরে। মাত্র কদিনের সাধারণ জ্বরে নুরুন্নেসার মত স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে মারা গেছে, একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে অবিশ্বাস করেছে। কাউকে কিছু না বলে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটেছে থানায়। ছোটখাট একটি তালুকের মালিক লতিফ সিকদার। সম্পন্ন গৃহস্থ। থানাওয়ালাদের সঙ্গে আনতে তার বেশি বেগ পেতে হল না। জনাই খাঁর বিরুদ্ধে থানার আক্রোশও আগে থেকেই ছিল। গোটাকয়েক যোগাযোগের কথা শোনা গিয়েছিল, তবু জনাই খাঁকে ধরা যায়নি। এই সুযোগ দারোগা সাহেব ছাড়লেন না। এসে জনাই খাঁর বাড়িঘর খানাতল্লাশী করলেন। কিছু পেলেন না। নুরুন্নেসার ঘর আর তার আনাচে কানাচে তল্লাশ করে ভাঙা একটা মিকশ্চারের শিশি মিলল। তিনি সেটাকে পকেটে পুরলেন। তারপর সব শুনে জবানবন্দী নিয়ে বললেন, 'এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। কবর খুঁড়ে শব বার করতে হবে।'

জনাই খাঁ অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে যে কেউ থানাপুলিশ করবার সাহস করতে পারে, একথা সে ভাবতে পারেনি। লতিফ সিকদারের ঘাড়ে কটা মাথা আছে, জনাই খাঁ তা সময় মত দেখে নেবে। দারোগা সাহেবের প্রস্তাবে সে জিভ কেটে বলল, 'একি

বলছেন আপনি ! নিজেও তো আপনি মুসলমান। মুসলমান হয়ে এমন কথা আপনি বললেন কি করে ! এমন গুণাহর কাজ আমি করতেই দিতে পারিনে। সমস্ত মুসলমান তাহলে দোজখে যাবে।'

দারোগা সাহেব বললেন, 'কিন্তু এর একটা ফয়সালা না করলে আমাকেও দোজখে পচে মরতে হবে। সন্দেহ যখন হয়েছে, কবর না খুঁড়লে চলবে না।'

জনাই খাঁ স্থানীয় মোল্লা-মুন্সী-মৌলবীদের সভা বসাল। তারা সবাই রায় দিল, এমন অশাস্ত্রীয় কাজ চলতেই পারে না। মুসলমানের কবর ভাঙার নিয়ম নেই। যে শান্তিতে ঘুমিয়েছে, তার শান্তিভঙ্গ করে পাপের ভাগী হতে যাবে কোন মূর্খ ?

কিন্তু লতিফ সিকদার আর একদল মোল্লা-মুন্সীকে এনে হাজির করল, তারা ঠিক উল্টো কথা বলতে লাগল। নজির দেখাল, সন্দেহস্থলে এমন আরো কোন কোন জায়গায় কবর খুলে ফেলা হয়েছে।

জরুরী টেলিগ্রাম করে দারোগা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি আনিয়ে নিলেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় কবর খোঁড়া শুরু হল। বড় একটা চটান জায়গায় খাঁ-দের কবরখানা। পাঁচ সাত জন লোক কোদাল হাতে খুঁড়তে লাগল।

গ্রামের সবাই এসে ভেঙে পড়েছে সেই কবরখানায়, গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে জনাই খাঁ ও মনাই খাঁকে। জনকয়েক পুলিশ-সেপাইর পক্ষে জনতা-নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু খুব যে তেমন একটা গোলমাল হচ্ছে তা নয়, খানকয়েক কোদালের শব্দ ছাড়া আরকোনো শব্দ নাই। রুদ্ধশ্বাসে সবাই অপেক্ষা করছে কবর থেকে কি ওঠে তাই দেখবার জন্যে।

এদিকে বড় হয়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে। পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথি। সমস্ত মাঠ ঘাট, আশেপাশের গাছপালাগুলির ডাল-পাতা জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে। তাল তাল জ্যোৎস্না জমে রয়েছে নুরুন্নেসার কবরের চারদিকে।

তারপর ধীরে ধীরে তোলা হল শবদেহ। আর একবারের জন্যে শুধু সরিয়ে ফেলা হল নুরুন্নেসার মুখের আবরণ। আকাশের আর একখানা চাঁদ। কিন্তু মড়া চাঁদ, ছেঁড়া চাঁদ, বিষে নীল বিবর্ণ চাঁদ।

ভুবন ডাক্তার হঠাৎ অস্ফুট এক আর্তনাদ করে উঠল। তারপর দুহাতে ঢাকল নিজের চোখ। জ্যোৎস্না-ঘেরা পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য মুছে গিয়েছে। পৃথিবীর অপরূপ সুন্দর প্রত্যেকটি মুখের ওপর কে যেন একখানা বিষাক্ত হাত দিয়েছে বুলিয়ে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল জনাই খাঁর, কিন্তু যার সবচেয়ে বেশি শাস্তি হওয়ার কথা ছিল—সেই ভুবন ডাক্তারের হল মাত্র সাত বছর। প্রীতির বাবা আর স্বামী দুজনেই যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। অর্থ দিয়ে, বড় বড় আইনজ্ঞ সংগ্রহ করে দিয়ে সবরকম আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন তাঁরা। কারণ ভুবনের মা তাঁদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিল, 'এ বিপদে আপনারা ছাড়া আর আমার কেউ নেই।'

প্রীতি কোনোদিন ভুবনের সামনে আসেনি, শুধু আড়াল থেকে সাহায্যের প্রেরণা জুগিয়েছে। একবার কেবল এসেছিল। নানা জেল ঘুরে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ভুবন তখন বদলি হয়েছে। চাঁপা ফুলের একখানা শাড়ি পরনে। গা-ভরা গয়না, সিঁথিতে সিঁদুর।

প্রীতি আস্তে আস্তে বলল, 'চিনতে পারছ ?'

কিন্তু ভুবন যেই কথা বলতে যাবে, দেখতে পেল ওর মুখের ওপর সেই নুরুন্নেসার মুখ। সেই নিহত নীল বিবর্ণ সৌন্দর্য। চেনা আর হল না, কথা বলা আর হল না। ভুবন দু হাতে ফের চোখ ঢাকল। খানিক বাদে চোখ যখন খুলল, প্রীতি চলে গেছে। প্রীতি চলে গেল, কিন্তু নুরুন্নেসা গেল না। সে রোজ রাত্রে, গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে পা টিপে টিপে আসে। জেলের এতগুলি প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে কি করে যে আসে, সে-ই জানে !

প্রথমে খানিকক্ষণ কোদালের শব্দ হয় ঝপ্ ঝপ্—ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্। হৃৎপিণ্ডের শব্দ হয় টিপ্ টিপ্ টিপ্—টিপ্ টিপ্ টিপ্, কবরের বাঁধ খুলে যায়, হৃদয়ের বাঁধ খুলে যায়। গুঁড়ো গুঁড়ো রাশ রাশ, চাপ চাপ মাটি দুপাশে উথলে পড়তে পড়তে পথ খুলে দেয়। আর সেই অতল গভীর সুড়ঙ্গ-পথ বেয়ে পা টিপে টিপে উঠে আসে পরমা সুন্দরী, যৌবনবতী এক কন্যা। তার জাত নেই, ধর্ম নেই, কাল নেই, বয়স নেই, নাম নেই, পরিচয় নেই, আছে শুধু অফুরন্ত যৌবন আর পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোৎস্নায় গড়া সৌন্দর্য। ভুবনের সামনে সে এসে দাঁড়ায়, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাণ-চাঞ্চল্য উদ্বেল হয়ে ওঠে। কাজলকালো দুই চোখে ফুটে ওঠে কাতর মিনতি—'কথা বল, কথা বল। আমি যে তোমার কথা শোনার জন্যেই এতদূর থেকে এসেছি।'

কিন্তু ভুবন যেই কথা বলতে যায় অমনি দেখে সেই যৌবনবতীর দেহে প্রাণ নেই। তার দেহ শবদেহ। সেই জ্যোৎস্না-ধৌত, স্বর্ণবর্ণ মুখ বিবর্ণ,—নীল, বিষে বিবর্ণ। ভুবন শিউরে চিৎকার করে ওঠে।

কিছুদিন কথা চলেছিল কয়েদীর গারদ থেকে ভুবনকে পাগলা গারদে পাঠাবার। কিন্তু দিনের বেলায় ওর সুস্থ স্বাভাবিক ব্যবহার দেখে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হল, ওর পাগলামিটা আসলে পাগলামির ভান। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রহরীদের প্রহারের মাত্রা দিনকয়েক বেশ বেড়েও গিয়েছিল।

তারপর একদিন খুলে গেল জেলগেট। ছাড়া পেল ভুবন। মা তার আগে মারা গেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন দেখে এল মাতৃভূমিকে। বাড়ি-ভরা আগাছার জঙ্গল আর কাঁটা গাছ। আর কোথাও কিছু নেই। শুধু নুরুন্নেসা নয়, জন্মের মত ভুবন ডাক্তারও কবরস্থ হয়েছে।

ফের কিছুদিন ঘুরে বেড়াল এখানে ওখানে ভবঘুরের মত। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই, কোথাও পরিত্রাণ নেই নুরুন্নেসার হাত থেকে। কোথাও বিরাম নেই, শেষ নেই তার নৈশাভিসারের।

অবশেষে ভুবন ফের এল গাঁয়ের বাড়িতে। মুখের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল পরিষ্কার করল। ভিটের কাঁটা গাছের জঙ্গল ফেলল কেটে। নিজেদের বারান্দায় চুপ-চাপ বসে থাকে, কারো

কাছে যায় না। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু গ্রামবাসীরা তার চারপাশে ভিড় করে আসে। এক অলৌকিক রহস্য যেন ঘিরে ধরেছে ভুবন ডাক্তারকে। সে রহস্যের কাছে যাওয়ার কারো সাহস নেই। শুধু দূর থেকেই তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে চলে। আরো অলৌকিক, আরো আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে সেই রহস্যকে আরো বিচিত্র করে তোলা যায়। কিন্তু খুনী ভুবন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায় না, তাকে কাছে ডাকা যায় না। কি জানি যদি গলা টিপে ধরে! গলা টিপবারই বা দরকার কি, তার সংস্পর্শই যথেষ্ট। তার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ, ডাক্তার বিষসিদ্ধ পুরুষ।

ভুবনের নিজেরও কোনো উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই মানুষের সঙ্গে মিশবার, সামাজিক মানুষের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্পর্ক রাখবার। গ্রামের প্রান্তে গরিব একঘর বুনো থাকে। তাদের শিকারের সঙ্গী হয় ভুবন। ভাগ পায় অন্নজলের।

এমনি করে প্রায় বছর খানেক কাটাবার পর হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড ঘটল। দিনে নয় রাত্রে। বেশ খানিকটা রাত আছে। অমাবস্যার কাছাকাছি তিথি। নিকষ কালো অন্ধকার সমস্ত গ্রামটায় ছড়িয়ে পড়েছে। আশে-পাশে অতি-পরিচিত গাছপালাগুলির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এক একটা গাছ যেন একটা ভূত আর সেই ভূতলোক ভুতনাথ হয়ে বারান্দায় একটা বেতের মোড়া পেতে চুপচাপ বসে আছে ভুবনমোহন, বসে বসে দেখছে। নিঃশব্দে উপভোগ করছে এই প্রেতলোককে।

হঠাৎ সেই গাছপালার জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি সত্যিকারের প্রেতিনী ছুটে এসে ভুবনের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, 'রক্ষে কর বাবা, রক্ষে কর, আমাকে বাঁচাও।'

ভূতাধীশ হয়েও ভুবন প্রথমটায় ভয় পেল, চমকে উঠল। ব্যাপার কি! প্রেতলোকেও মৃত্যুর ভয়! ঘর থেকে হ্যারিকনে নিয়ে এল ভুবন। এনে ধরল প্রেতিনীর মুখের সামনে। দেখল প্রেতিনী নয়, পাশের বাড়ির হারাণ ভট্টাচার্যের প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রী। কিন্তু প্রেতিনীর সঙ্গে তার বিশেষ তফাতও নেই। রোগা, অস্থিসার চেহারা। পরনে খাটো আধময়লা ছেঁড়া একখানা থান। পিঠে কাঁধে চোখে মুখে শনের নুড়ির মত একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি আবার বললেন, 'আমাকে রক্ষে কর বাবা, আমাকে বাঁচাও।'

ভুবন ডাক্তার মনে মনে বলল, 'বাঁচাবার আমি কে? আমি তো মৃত্যু-সাধক, মৃত্যু-সিদ্ধ। কি করে বাঁচতে হয়, বাঁচাতে হয়, আমি ভুলে গেছি।'

কিন্তু হারাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল অন্য ভাষায়, বলল, 'কি হয়েছে আপনার?'

'সর্বনাশ হয়েছে বাবা, সর্বনাশ হয়েছে! আমার নিমি বিষ খেয়েছে। নন্দ ডাক্তার বাড়িতে নেই। আর কেউ নেই তাকে রক্ষা করবার! শুধু তুমি পারো। তুমি পারো তাকে বাঁচাতে। তুমি নাকি অনেক মন্তর তন্তর শিখে এসেছ, অনেক গাছড়া পাথর নিয়ে এসেছ! সেই সব নিয়ে চল। তোমার সব গুণজ্ঞান দিয়ে আমার নিমিকে তুমি বাঁচিয়ে তোল।'

ভুবন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা চলুন।'

গোটা কয়েক জংলা পরিত্যক্ত ভিটে আর বাঁশঝাড় পার হয়ে ভুবন এসে পৌছল হারাণ

ভট্টাচার্যের বাড়ি। সে বাড়ি জংলা, সে বাড়িও প্রায় পরিত্যক্ত। শুধু উত্তরের ভিটেয় জীর্ণ একখানা ছনের ঘর পড়োপড়ো হয়েও কোনোরকমে আত্মরক্ষা করছে।

ভুবনকে নিয়ে তার ভিতর ঢুকল নিমির মা। আঠার-উনিশ বছরের কালো রোগা কুদর্শনা একটি মেয়ে মেঝের ওপর একটা ছেঁড়া মাদুরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। গাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে, ভুবন জিজ্ঞেস করল, 'কেন, বিষ খেল কেন?'

নিমির মা বললেন, 'সে কথা বলবার নয় বাবা। চাটুয্যেদের বীরেন বিয়ের লোভ দেখিয়ে ওর সর্বনাশ করে সরে পড়েছে। আমি গোড়া থেকেই সাবধান করেছিলাম। অভাগী শুনল, না, মজল, তারপর বিষ খেয়ে মরল।'

ভুবন ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে নাড়ী ধরল নির্মলার। এখনো জীবনের স্পন্দন আছে। আশা আছে এখনো। মুখ তুলে বলল, 'শিগ্‌গির লোকজনকে খবর দিন। নন্দ ডাক্তারের বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র আর ওষুধ-টষুধ নিয়ে আসুক, আমি লিখে দিচ্ছি।'

নির্মলার মা অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার গাছড়া, তোমার পাথর!'

ভুবন ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল, 'যা বলছি তাই করুন আগে।'

খানিক বাদে উঠানে লোক ভেঙে পড়ল। দরকারি জিনিসপত্রগুলিও পৌছল এসে। নির্মলার শিরা-উপশিরা থেকে সমস্ত বিষ নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়ার জন্যে তার সব জ্ঞান, সব বিদ্যে-বুদ্ধি প্রয়োগ করল ভুবন ডাক্তার।

শেষ রাত্রের দিকে রোগিণীর জ্ঞান হল, সে কথা বলল। প্রথমেই বলল, 'আমাকে বাঁচালে কেন?'

ভুবন ডাক্তার তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রত্যক্ষ করছিল প্রথম প্রাণসত্তাকে, রোগিণীর কথার জবাবে বলল, 'আমিও বাঁচব বলে।'

রোগিণীর মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ডাক্তারের মনে হল, এমুখ তার চেনা, এ মুখ সে দেখেছে, রোজ রাত্রে দেখেছে। এ সেই নুরুন্নেসার পরম সুন্দর মুখ। কিন্তু এখন আর মৃত নয়, বিবর্ণ নয়, প্রাণবন্ত। জীবনের রসে, রঙে রূপময়। সেই রূপ অপলক চোখে বসে বসে দেখতে লাগল ভুবন ডাক্তার।

তারপর শুধু ওদের ঘরে বসে দেখলেই চলল না, নিজের ঘরেও নির্মলাকে নিয়ে আসতে হল।

নির্মলার মা বললেন, 'এত কলঙ্ক-কেলেঙ্কারির পর ও হতভাগিনীকে আর কে নেবে? তুমি যখন বাঁচিয়েছ, তুমিই ওকে উদ্ধার কর। একা থাকলে অভাগী আবার কি কাণ্ড ঘটাবে কে জানে!'

দ্বিধাগ্রস্ত ভুবন ডাক্তার বলল, 'কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে।'

নির্মলার মা হেসে বললেন, 'পুরুষ মানুষের এ বয়স আবার একটা বয়স নাকি?'

কৃতজ্ঞ নির্মলার চোখেও একথার সানুরাগ সমর্থন মিলল।

জনাই খাঁ ও মনাই খাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামে আগেই এসে পৌছেছিল। কিন্তু বেঁচে ছিল

লতিফ সিকদার। তখন ঘরে তার দু-দুজন বিবি, আর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তবু ভুবন ডাক্তারকে সামনে দেখে তার দুই চোখ আরক্ত হয়ে উঠল, রূঢ়স্বরে বলল, 'কি চান আপনি?'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'একটা হাসপাতাল খুলতে চাই। আপনি তার সেক্রেটারি হবেন। যে বিষ তাকে একদিন দিয়েছিলাম প্রত্যেক রুগ্ন স্ত্রী-পুরুষের ভিতর থেকে সেই বিষ প্রাণপণে নিংড়ে বার করব। এ ছাড়া বাকি জীবনে আমার আর কোনো কাজ নেই।'

লতিফ সিকদার বলল, 'সাহায্য আমি করতে পারি; কিন্তু সেক্রেটারির পোস্টটি যেন ঠিক থাকে। শেষে যেন নড়চড় না হয়।'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'মোটেই তা হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

লতিফ সিকদার তখন খুশি হয়ে বসতে দিল ভুবন ডাক্তারকে। পান-তামাকের ফরমাশ পাঠাল অন্দরমহলে।

সোনারূপার মেডেলগুলি, সার্টিফিকেট, লাইসেন্স সবই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সেগুলি আর ফিরে এল না। কিন্তু একটু একটু করে আসতে লাগল ভুবন ডাক্তারের খ্যাতি। রোগ-নির্ণয় আর চিকিৎসায় তার অসাধারণ দক্ষতার কথা সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। শুধু যশ নয়, অর্থাগমও হতে লাগল প্রচুর। বিপদই যে শুধু দল বেঁধে আসে তা নয়, সম্পদও দলবল ভালবাসে।

কাহিনী শেষ করলেন ভুবন ডাক্তার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নুরুন্নেসাকে এখনও কি স্বপ্নে দেখেন আপনি?'

সাদা মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভুবন ডাক্তার।

দেখেন বইকি। তাকে এখনও মাঝে মাঝে দেখতে পান ভুবন ডাক্তার। সেই স্বপ্নচারিণীর নৈশাভিসার আজও শেষ হয়নি। এখনও মাঝে মাঝে আসে এক একটি জ্যোৎস্না-ধবল রাত। কোদালের কোপে দ্বিধাবিভক্ত মাটি তার সুড়ঙ্গ-পথ খুলে দেয়। আর তার ভিতর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী, পরম রমণীয়া কন্যা। ভুবন ডাক্তারের বুকের মধ্যে টিপ টিপ টিপ টিপ শব্দ হয়। ঘামে ভিজে যায় সর্বাঙ্গ। শেষে স্ত্রী তাঁকে ডেকে জাগিয়ে তোলেন।

'আমার স্ত্রী বলে কি জানেন?—নুরুন্নেসা আমার সতীন।'

ভুবন ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

আমি হেসে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম আর একখানা হাসি-মুখ দরজার ওপাশ থেকে সরে গেল।

সারিবদ্ধ কালো কালো তালগাছগুলির পুবদিকে ওপারে সোনালি আভাস দেখা দিয়েছে। এক্ষুণি চাঁদ উঠবে।

ভুবন ডাক্তার বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। হাসপাতালে যাওয়ার সময় হয়েছে।

প্রব্রজন